অরুণ মিত্র

কবির সমর সেন

কোনো কাব্যের গুণাগুণ পর্যালোচনায় বয়েসকে যদি একটা নিরিখ ব'লে ধরা যায়, তাহলে বলতে হয় সমর সেনের সমকক্ষ কাউকে বোধহয় আমরা পাইনি বাংলা সাহিত্যে। প্রশ্নটা শুধু অল্পবয়েসে কাব্যরচনার নয়। বাঙালীরা জন্মেই কবি, এমন একটা সুখ্যাতি বা অখ্যাতি প্রচারিত আছে। অবশ্য অল্পবয়েসে বাঙালীরা যে সাধারণত কবিতা লেখায় হাত লাগায়, তা ঠিক (বয়ঃসন্ধির আবেগে কবিতা হয়তো অন্যেরাও লেখে), কিন্তু সমর সেনের আরম্ভ উল্লেখযোগ্য শুধু বয়েসের জন্যে নয়, বয়েসের সঙ্গে ব্যতিক্রমীভাবে যুক্ত এমন এক মাত্রার জন্যে যার তুলনা বিরল। তিনি যখন কবিতা লিখতে এবং পত্রিকায় প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন তখন তিনি সদ্য কৈশোর পেরোনো এক ছাত্র। কিন্তু যে-কবিতা তিনি লিখলেন তা মোটেই বালকসুলভ নয়, তাতে বোধ ও সংবেদনার যে-ছাপ পড়ল তা এক পরিণত মানুষের। আধুনিক কাব্যে আরো দুইজনের নাম এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য : সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁরাও অল্প বয়েসে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে সমর সেনের বিশিষ্টতা একদিক থেকে অনন্য। তিনি প্রকরণে ও পদ্ধতিতে এক নতুন কাব্যধারাই প্রবর্তন করলেন বলা যায়। এই ধারা বাংলা কাব্যে তাঁর পূর্বগামীদের দ্বারা প্রভাবিত নয়। তৎকালীন আধুনিকতার যাঁরা কবি-নেতা, তাঁরা তাঁকে শিষ্য করতে পারেননি।

সমর সেনের কবিতার গঠনকে সাধারণ চিহ্নিত করা হয় গদ্যছন্দ নামে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ থেকে তা পৃথক। সমর সেন কাটা-কাটা শব্দে এবং খণ্ড খণ্ড প্রতীকী চিত্র ও ব্যঞ্জনার আশ্রয়ে কবিতাকে এক সংহত রূপ দিলেন এই ছন্দে, যা তাঁর প্রধান প্রকাশ-পদ্ধতি হিসেবে বজায় ছিল শেষ পর্যন্ত, শুধু বাক্যের প্রবহমানতা কিছু বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর কবিতায় যে-সুর শোনা গেল, তাও আমাদের এখানে নতুন। প্রথম পর্বের বিভিন্ন রচনায় বিধুরতা, চাপা যন্ত্রণা, ঝলকি প্রত্যাশার পরই বিষাদ ও নৈরাশ্যের ছায়া বাংলা কাব্যে এক অন্য স্বাদ নিয়ে এল। তাঁর এসব কবিতায় বিষয়ের ধরাছোঁয়ার বদলে আমার চোখে ফুটে ওঠে এক মেজাজ, mood, সম্ভবস্তব্দ ও শব্দগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি যাকে গাঢ় ক'রে তোলে। এমন mood-এর কবিতা আমাদের ছিল না আগে। কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

স্তব্ধ রাত্রে কেন তুমি বাইরে যাও?
আকাশে চাঁদ নেই, আকাশ অন্ধকার,
বিশাল অন্ধকারে শুধু একটি তারা কাঁপে,
হাওয়ায় কাঁপে শুধু একটি তারা।
কেন তুমি বাইরে যাও স্তব্ধরাত্রে
আমাকে একলা ফেলে?...
আমাকে কেন ছেড়ে যাও

মিলনের মুহূর্ত হতে বিরহরে স্তব্ধতায়?
মাঝে মাঝে চকিতে যেন অনুভব করি
তোমার নিঃশব্দতার ছন্দ;
সহসা বুঝতে পারি;
দিনের পরে কেন রাত আসে
আর তারারা কাঁপে আপন মনে,...
বুঝতে পারি কেন
স্তব্ধ অর্ধরাত্রে আমাকে তুমি ছেড়ে যাও
মিলনের মুহূর্ত থেকে বিরহের স্তব্ধতায়

(নিঃশব্দতার ছন্দ)

এবং

ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি।
বাতাসে ফুলের গন্ধ,
বাতাসে ফুলের গন্ধ,
আর কিসের হাহাকার।
ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি
নির্জন প্রান্তরের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়।
বাতাসে ফুলের গন্ধ,
আর কিসের হাহাকার।

(একটি রাত্রের সুর)

এবং

রজনীগন্ধার আড়ালে কী যেন কাঁপে,
কী যেন কাঁপে
পাহাড়ের স্তব্ধ গভীরতায়।
তুমি এখনো এলে না।
সন্ধ্যা নেমে এল, পশ্চিমের করুণ আকাশ,
গন্ধে-ভরা হাওয়া,
আর পাতার মর্মর-ধ্বনি।

(বিরহ)

একই সুরে আরো :

সে হাওয়ায় শুধু যেন শুনি,
কান পেতে শুনি
কোন সুদূর দিগন্তের কান্না;

সে কান্না যেন আমার ক্লান্তি,
আর তোমার চোখের বিষণ্ণ অন্ধকার।

(দুঃস্বপ্ন)

পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,
আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ।

(মুক্তি)

কিছুই নয়, শুধু আকাশের মহাশূন্য ঝরাপাতার ক্লান্তি,
আর হাওয়ায়
নামহীন ফুলের অদ্ভুত চাপা গন্ধ
মুহূর্তগুলির নিঃশব্দ কান্না মতো;

(চার অধ্যায়)

অন্ধকার, ক্লান্তি, হাহাকার, বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা, বিধুর বাসনা আর এক অনির্দেশ্য বিষাদ কবিতার পর কবিতায় ছড়িয়ে থাকে। এই বিমূর্ত যন্ত্রণাকে romantic agony ছাড়া আর কী বলব? কিন্তু এরই মধ্যে এক-একটা ঝলক দেখা যায়, যাকে আশারই ঝলক বলতে হয়, যদিও তা ক্ষণস্থায়ী। এই আবহাওয়া থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও তাতে ধ্বনিত হয় :

যদি ঝড় নেমে আসে,
শব্দের তীব্র আঘাতে আকাশ চূর্ণ ক'রে
অন্ধকারে ঝড় নেমে আসে
ঝড় নেমে আসে বিশাল, গভীর অন্ধকারে,
তাহলে হয়তো, হয়তো আমার মনে শান্তি আসবে।

(ঝড়)

'মেঘ-মদির মহুয়ার দেশের' কথাও তাঁর মনে আসে, কয়লাখনির 'গভীর' বিশাল শব্দ' তিনি শুনতে পান, কিন্তু 'শিশিরে-ভেজা সবুজ সকালে অবসন্ন মানুষের শরীরে ধুলোর কলঙ্ক' তিনি দেখেন এবং তাদের 'ঘুমহীন চোখে ক্লান্ত দুঃস্বপ্নের হানা' টের পান।

কিন্তু তাঁর mood বেশিদিন শূন্যচারী থকেনি, অল্পকালের মধ্যেই মাটিতে শিকড় নামিয়ে দেয়। সে-মাটি শহুরে মধ্যবিত্তের জীবন ও পরিপার্শ্ব, বস্তুত যা ছিল তাঁর নামহীন যন্ত্রণা ও বিষাদের উৎস। মধ্যবিত্ত নাগরিক অস্তিত্বের গ্লানি, তার বিবর্ণ দৈনন্দিনতা, তার সঙ্কীর্ণতা, আত্মপরায়ণতা এবং অসহায়তা সমর সেন তাঁর কবিজীবনে অচিরেই চিনে নিয়েছিলেন। তাঁর এই চেতনা তাঁকে বিষাদে ও একাকীত্বে আচ্ছন্ন করেছিল এবং এই মধ্যবিত্ত প্রাণধারণের অংশীদার হিসেবে তাঁকে আত্ম-করুণাতেও প্রণোদিত করেছিল। তাঁর পরিচিত জীবন সম্বন্ধে কোনো মোহ আর তাঁর ছিল না। এই মোহভঙ্গই অধিকাংশ সময় এক নৈরাশ্যে রূপ নিয়েছে, এক-এক সময় অসীম নৈরাশ্যের চিত্রকল্পে, যেমন :

সমুদ্র শেষ হল;
গভীর বনে আর হরিণ নেই,
সবুজ পাখি গিয়েছে মরে,
আর পাহাড়ের ধূসর অন্ধকারে
দুরন্ত অন্ধকার ডানা ঝাড়ে
উড়ন্ত পাখির মতো।
সমুদ্র শেষ হল
চাঁদের আলোয়
সময়ের শূন্য মরুভূমি জ্বলে।

(স্বর্গ হতে বিদায়)

এই আবহাওয়া থেকে পরিত্রাণের আকুলতা তাঁর মনে যে-প্রত্যাশাকে ক্ষণিক আশ্রয় দিয়েছে তা যেন স্বপ্নের প্রত্যাশা। তবু মধ্যবিত্ত প্রাত্যহিকের গ্লানিকর চেতনা তাঁকে বার বার সেই স্বপ্ন দেখিয়েছে। এবং তাঁর প্রত্যাশা সব সময় অলস স্বপ্নেই শেষ হয়নি, তা বাস্তবকে স্পর্শ করেছে বলতে পারি। কারণ তা রূপান্তরিত হয়েছে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের আবাহনে, অনুভবে। প্রথম পর্বেই তিনি লেখেন :

মনে হয় যেন সামনে দেখি—
দুধারে গাছের সবুজ বন্যা,...
কিছুক্ষণ পরে হাওয়ার জোয়ার আসবে
দূর সমুদ্রের কোনো দ্বীপ থেকে,...
সেখানে সমস্ত দিন সবুজ সমুদ্রের পরে
লাল সূর্যাস্ত
আর বলিষ্ঠ মানুষ, স্পন্দমান স্বপ্ন—
.....
ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়
হে মহানগরী!
রুদ্ধশ্বা রাত্রি শেষে
জ্বলন্ত আগুনের পাশে আমাদের প্রার্থনা,
সমান জীবনের অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন
.....
মাঝে মাঝে আকাশে শুনি
হাওয়ার চাবুক,
আর ঝাপসাভাবে শুধু অনুভব করি
চারদিকে ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চারণ।

এবং

আর মদির মধ্যরাত্রে মাঝে মাঝে বলি :
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও,
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।
কলতলার ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙে
আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

(একটি বেকার প্রেমিক)

এই ইতিবাচক দিক তাঁর কবিতায় পরে আরো স্পষ্ট হয়, কখনো-কখনো এমন অতিরিক্ত রকম স্পষ্ট যে, তা কাব্যের এলাকায় আর থাকে না। এসত্ত্বেও মনে হয় তাঁর কবিতার ধারাবাহিক প্রধান সুর মধ্যবিত্ত জীবনের ও মধ্যবিত্ত চরিত্রের প্রতি অন্তহীন ঘৃণা ও বিদ্রূপ ও আত্মধিক্কার। শেষ পর্বের কবিতাতেও তিনি "মধ্যবিত্ত মানসের বিড়ম্বিত গ্লানি"-র (বিকলন) উল্লেখ করেছেন। একই অবক্ষয়, ক্লিন্নতা, ক্ষুদ্রতা এবং গতানুগতিকতার ছবি বারে বারে দেখি তাঁর কবিতায়। এমনকি, যখন তিনি সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রসঙ্গ আনছেন তাঁর কবিতায়, তখনো সাম্যবাদ ও প্রগতির সমর্থক মধ্যবিত্ত কবি-প্রবক্তাদের বিদ্রূপ করতে তিনি ছাড়ছেন না, এবং নিজেকেও সেইসঙ্গে :

যদিচ পৈত্রিক আশ্রয়ে এখনো বসবাস,
যদিচ বেকার, নিঃসঙ্গ, মনে মনে প্রেমিক,
তথাপি বামপন্থী পত্রিকায়
আসন্ন বিপ্লবের গান অবশ্য উচিত।

(পরিস্থিতি)

তারপর চায়ের দোকানে ব'সে সহসা ভেবেছি
আজকাল ঘরে ঘরে সমাজধার্মিক অনেক,
মুখে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বুলি
মনে রোমান্টিক বুলবুলের অবিরত গান,
তুমি ছিলে তারি একজন।
এ অধমও তারি একজন

(কয়েকটি মৃত্যু)

আমি রোমান্টিক কবি নই, আমি মার্ক্সিস্ট।
অনেকে জিজ্ঞেস করে : গুরুদেবের দৃষ্টির সঙ্গে
তোমার তফাতটা কী? তফাতটা এই :

বেদ উপনিষদের বুলি মুখে তিনি বরাবর,
অক্লান্ত বাউল, একই নৌকোয়
একঘেয়ে খেয়া পারাপার করেছেন;
কিন্তু জড়বাদী সুবুদ্ধির জোরে আজ আমি
দু-নৌকোয় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি,
বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর
ভাগ্যবান এ কবিকে বিপুলা যশোদা,
নিশ্চয় দেবেন বলে আমার বিশ্বাস।
জীবনযাত্রার গতি বদলাতে তাই
বিশেষ আগ্রহ নেই, প্রয়োজনও দেখি না।
.....
লেনিন, স্টালিন, জুখভ্ ও গোর্কি,
তাদের আমরা চিনি। কিন্তু বুঝি না তাকে,
দুধ ও তামাকে সমান আগ্রহ যার,
দু-নৌকোর যাত্রী এই বাঙালী কবিকে,
বুঝি না নিজেকে।

(২২শে জুন)

আত্মকরুণা এবং মধ্যবিত্ত নীতিহীনতা, এ-দুয়ের চিত্রণ কোনো পর্যায়েই ক্ষান্ত হয়নি সমর সেনের কাব্যে। বরাবরই চলতে থাকে। বেশ আগের রচনা 'রোমন্থন'-এ জীবনস্মৃতির ধারায় সামগ্রিকভাবে নিজের শ্রেণীগত চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে যে-স্বীকারোক্তি শুনি, শেষ কবিতা 'জন্মদিন'-এর শেষ কয়েক ছত্র কাব্যিক পালার যবনিকা ফেলে যেন তারই অন্তিম অংশ হিসেবে। আদ্যন্ত এই প্রকাশ অবশ্য সমর সেনের মানসিক সততা ও সত্যনিষ্ঠারই নিদর্শন। কিন্তু এ থেকে তাঁর মনের একটা একমুখী প্রতিক্রিয়ারও পরিচয় পাই, যা তাঁর কাব্যিক উৎসারে তাঁকে বাধা দেয়, অনবরত পেছনে টানে, আটকেও রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যখন সাম্যবাদী আদর্শ ও রাজনীতির কথা ক্রমেই খোলাখুলি বলছেন তখনও।

তাঁর কাব্যে সমাজনীতি ও রাজনীতি স্পষ্টভাবে প্রবেশ করে এই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই। এরই কঠিন আগের পর্বে প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্ত বিশ্বাস যেন বর্তমানের নৈরাশ্যে টলমল, যেমন 'ঘরে বাইরে' কবিতায় দেখি :

...মাঝে মাঝে উদ্যত যমদূত ক্লান্ত হতাশা আঁকে
দিন রাত্রির নরকের সিংহদ্বারে।
তবু জানি, কালের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী
যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে,
তবু জানি,

জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে
ততদিন
ততদিন নারীধর্ষণের ইতিহাস
পেস্তাচেরা চোখ মেলে শেষহীন পড়া
অন্ধকূপে স্তব্ধ ইঁদুরের মতো,...

ক্রমে তাঁর বিশ্বাস এক অটল মূর্তি নিতে থাকে এবং অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষতার দিকে ঝোঁকে। যথা—

জানি ওরা নয় বৈশ্য সভ্যতার জারজ সন্তান,
গলিত ধনতন্ত্রের চতুর বিভীষণ;
তাই সক্রিয় আশা মৃত্যুহীন জাগে অনেকের মনে;
অপরের শস্যলোভী, পরজীবী পঙ্গপাল
পিষ্ট হবে হাতুড়িতে, ছিন্ন হবে কাস্তেতে।

(নানাকথা)

আসমুদ্রহিমাচল হে হিন্দুস্থান,
কানে বাজে
ক্ষুরধার নদীসঙ্কুল চীনের আহ্বান
কৃষ্ণসাগর থেকে বাল্টিক পর্যন্ত
বিপর্যস্ত সোভিয়েট-ভূমির মৃত্যুঞ্জয় গান...
.....
এ করাল সংক্রান্তি নিঃসন্দেহে পার হব
যে মৃত্যু প্রাণ আনে তার ফিনিক্স গানে,
প্রগতির সম্মিলিত বীর্যে, অক্লান্ত আত্মদানে।

(বসন্ত)

এই প্রত্যক্ষতা এতদূর অগ্রসর হয় যে, অনেক জায়গায় কবিতা বিবৃতির চেহারা নেয়। 'পঞ্চম বাহিনী' শীর্ষক রচনায় তো বুড়ো মজুরের উর্দু জবানই অনেকখানি বসিয়ে দেন লেখক :

বুড়ো মজুর বলে : হমারা হিন্দুস্থান নেহি দেঙ্গে।
হিম্মৎ হ্যায়, জানোয়ার মারনেকে লিয়ে মরনেকে লিয়ে তৈয়ার,
ভাই আনোয়ার, হতিয়ার চাহিয়ে, তেজ হাতিয়ার।
হিন্দুস্থানকী ইজ্জৎ বাঁচ নেহি শক্‌তি ইস্‌ কালে বুরখেমে
ব্লাক-আউট তো বিলকুল মজবুরীকা বাত হ্যায়... ইত্যাদি

এবং আরো পরে সুদীর্ঘ 'খোলা চিঠি' কবিতায় ছত্রের পর ছত্র নিরাবরণ বর্ণনা এবং বিশদ ঘোষণা। যেমন, এই শেষাংশ :

এ বসন্ত কাদের? লক্ষ লাল সৈন্য অগ্রসর বলিষ্ঠ জয়গানে,
রক্তলোভী বন্য সৈন্য হত হয় অক্লান্ত অভিযানে,
উদয়ী সূর্যের দেশ প্রাচ্যে ছায়া ফেলে, লড়ে বীর চীনে
নির্মম সঙ্গীনে।
অসংখ্য বর্গীর গোরস্থানে
পুঁজিবাদ চূর্ণ হবে সারা দুনিয়ায়, লুপ্ত হবে এ হিন্দুস্থানে,
হে সরকার, হুজুর সরকার,
হুজুর বড়োলাট, জঙ্গীলাট, বর্মাবীর আলেকজাণ্ডার,
আমরা বান্দা এখনো, তবু বন্দী তোমরা নিজেদের জালে
ইতিহাসের জাঁতাকলে, আত্মঘাতী নসীবের ফলে।

মাঝে মাঝে অবশ্য কবিতার ঝলক দেখি আশা ও সঙ্কল্পকে জড়িয়ে। যেমন ঐ 'পঞ্চম বাহিনী' কবিতাতেই :

কিন্তু আগামীকাল আসুক ঘর-ফিরতি মজুরের গানে
কুমারীর আত্মদানের প্রথম বেদনায়
নবজাত শিশুর সহজ কান্নায়;
শতাব্দীর যন্ত্রণার পর
নতুন দিক আসুক সভ্যতার পরম চিত্তশুদ্ধিতে।

কিংবা '২২শে জুন' কবিতার উপসংহারে :

আশা রাখি একদিন এ কান্তার পার হয়ে পাব
লোকের বসতি, হরিৎ প্রান্তরে শ্যামবর্ণ মানুষের
গ্রাম্যগানে গোধূলিতে মেঠো পথ ভরে,
পরিচ্ছন্ন খোশগল্পে মুখরিত ঘনিষ্ঠ নগর
বাংলার লোহিত সকালে সকলের অক্লান্ত সফর।

তবু স্পষ্ট বিবৃতির ঝোঁকই যেন ক্রমে প্রবল হয়ে ওঠে, আরো পরের কবিতা 'গৃহস্থবিলাপ'-এ যার সাক্ষাৎ পাই, বিশেষত তার শেষ ছত্রাবলীতে :

ঘুণধরা আমাদের হাড়,
শ্রেণীত্যাগে তবু কিছু আশা আছে বাঁচবার।
যারা মাঠে খাটে,
উদ্দাম নদীতে জাল ফেলে
মাছ ধরে যারা আনে হাটে,
ধান জল বিদ্যুত কয়লা
আনে যারা নগরিয়া ঘরে ঘরে,
সরায় ময়লা, দুধ দেয় যে গয়লা

তাদের মিতালি খুঁজি।
তাদের জীবন কর্কশ কঠিন,
হয়তো মলিন
নিরক্ষর অতীতের জগদ্দল চাপে,
তবু তারা কালের সারথি,
তাদের দোস্তি, তাদের গতি
আমার পরমা যতি।

কিংবা অন্তিম পর্বে 'লোকের হাটে' কবিতায় :

রমজানের শেষ দিন আজ; উৎসবের আগে যেন মনে রাখি :
আমাদের মতো সাধারণ লোক
আজ দেশে দেশে
মুষ্টিবদ্ধ প্রতিজ্ঞায়, আত্মদানে, আপনজনের ক্ষয়ে
জীবনের বনিয়াদ গড়ে। যেন মনে রাখি
চল্লিশ কোটি আমরা, বিরাট এ দেশ, এখানে নোকরশাহীর হবে শেষ
যদি বাজে রাম ও রহিমের কণ্ঠে আসমুদ্র-হিমাচল গান
স্বাধীন হিন্দুস্থানে আজাদ পাকিস্থান।

মনে হয়, কবিতার আকর্ষণ যেন ফুরিয়ে এসেছে এই কবির মনে। তার চাইতে গদ্যের বাক্যে, খোলাখুলি কথা বলা যেন তাঁর কাছে বেশি জরুরী হয়ে উঠছে। শেষ কবিতা 'জন্মদিন'-এ তো কবিতা সম্বন্ধে মোহভঙ্গই প্রকাশ পায় :

ভুলে গেছি বাগবাজারী রকে আড্ডার মৌতাত,
বালিগঞ্জের লপেটা চাল,
আর ডালহাউসীর আর ক্লাইভ স্ট্রীটের হীরক প্রলাপ,
ডকে জাহাজের বিদেশী ডাক।
রোমান্টিক ব্যাধি আর রূপান্তরিত হয় না কবিতায়।

এই মোহভঙ্গই কি সমর সেনকে কবিতা রচনা থেকে বিরত হওয়ার সিদ্ধান্তে নিয়ে যায়? নাকি অন্য কারণও তার সঙ্গে জড়িত ছিল? তাঁর কাছে বাংলা কবিতার যথেষ্ট প্রত্যাশা ছিল বলে এই প্রশ্ন আমাদের পীড়া দেয়। কিন্তু তিনি নিজে এক পরোক্ষ বিরূপতা এবং ঔদাসীন্য প্রকাশ করা ছাড়া বিশদভাবে কিছুই বলেননি। সুতরাং এ-রহস্যের উন্মোচনে অনুমানই আমাদের একমাত্র নির্ভর। সে-অনুমানের ভিত্তি তাঁর জীবন ও কবিকর্ম ছাড়া আর কী হতে পারে? আমার মনে হয়, বিষয়টা বস্তুমূল (objective) এবং আত্মমূল (subjective), দুই দিক থেকে বিবেচ্য এবং এ দুই দিক সংযুক্তভাবে একটা সন্ধান হয়তো দিতে পারে।

কবিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সমর সেন সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সাংবাদিকতায়। কিন্তু তা সাধারণ সাংবাদিক বৃত্তি নয়। অবশ্য সে-বৃত্তিতে তিনি এক সময়ে

প্রবেশ করেন এবং নানা প্রতিষ্ঠানে কাজও করেন, তবে শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেননি। কারণ তাঁর চিন্তার প্রকাশ সেখানে অন্যের নির্দেশাধীন ছিল। স্থায়ী বৃত্তি হিসেবে তিনি যে-সাংবাদিকতা নির্বাচন করলেন তা স্বাধীন এবং তা তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তার বাহন। এখানে তিনি কখনো আপস করেননি। এবং এই স্বাধীনতা ও বৈপ্লবিকতার জন্যে তাঁকে অবশিষ্ট জীবনে যথেষ্ট ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছে। পরিষ্কার গদ্যে সর্বাঙ্গীণ বাস্তবদশা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা অবাধে প্রকাশ করা তাঁর কাছে জরুরী হয়ে ওঠে, যার চিহ্ন তাঁর কবিতার মধ্যেই আমরা পাই। অবশ্য তাঁর সাংবাদিকতার এই গদ্য বাংলা নয়, ইংরিজি। কিন্তু তার পঠনক্ষেত্রে তো সমগ্র ভারত এবং অন্যান্য দেশ। সুতরাং বাংলা কবিতা থেকে সরে যাওয়া যদি তাঁর প্রয়োজনীয় মনে হয়ে থাকে, তবে বাংলা ভাষার সীমাবদ্ধ না থাকাও তাঁর পক্ষে খুব স্বাভাবিক।

কিন্তু এই বস্তুগত কারণের পাশাপাশি তাঁর কবিতার রূপায়ণ সংক্রান্ত অন্য কথাও মনে আসে। আমরা লক্ষ্য করি, ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত তাঁর কাব্য-ভ্রমণে চলনের তেমন হেরফের নেই, বাক্যের গ্রন্থন খানিকটা সহজ হওয়া ছাড়া। অর্থাৎ রচনার পদ্ধতি মোটের উপর একই রকম : কাটা-কাটা কথা, টুকরো টুকরো ছবি এবং ব্যঞ্জনা। কাঠামোর দিক থেকে পরে তিনি কখনো কখনো মিলের আশ্রয় নিচ্ছিলেন এবং কোনো কোনো কবিতা প্রাচীন ছন্দেও রচনা করেছিলেন, বিশেষত যা শ্লেষাত্মক। কিন্তু প্রধান কাব্যশরীরে এ-লক্ষণ অকিঞ্চিৎকর, হয়তো তাৎপর্যহীন বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে যে-বদলটা লক্ষণীয়ভাবে আসছিল, তার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। তা হল বিবৃতিধর্মী বাচন। কিন্তু সে তো কবিতা-বর্জনেরই এক পূর্বাভাস। এক কথায় বলতে হলে বলব, তাঁর চিন্তা এবং বক্তব্যের উপযোগী কোনো বিস্তার কবিতার রূপায়ণে আসছিল না। এমন কোনো পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল না, যাকে কবিতারই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণের নিদর্শন বলে ধরা যায়।

আর ভিতরের দিকে তাকালে দেখি, নিজের শ্রেণী-পরিচয় তাঁকে বিক্ষুব্ধ করছিল বার বার। শহুরে মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী অন্তঃসারশূন্য চরিত্র তাঁর অশ্রদ্ধা জাগায় প্রথম থেকেই এবং এই শ্রেণীর একজন বলে তিনি নিজেকেও রেহাই দেননি কখনো। এই বিতৃষ্ণা তাঁর স্মরণকে বিচলিত করেছে একেবারে শেষ পর্যন্ত। এই কারণে একটা ছক দেখা দিচ্ছিল তাঁর সৃষ্টিকর্মে, এবং পুনরাবৃত্তির এক প্রবণতা। কবিতার রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে তা থেকে বেরিয়ে আসতে তিনি পারছিলেন না যেন। এ-অবস্থায় কবিতাকে বিসর্জন দেওয়া তাঁর মতো মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। আমি বলছি সেই মানুষের পক্ষে যিনি অটলভাবে আত্মপ্রতারণা-বিমুখ ছিলেন এবং যাঁর মনে বুদ্ধির সন্ধানী আলো সর্বক্ষণ জ্বলত। এ-সবই অনুমানের কথা অবশ্য : লক্ষণ থেকে অনুমান। কিন্তু কারণ যাই হোক, আমরা যারা তাঁর কবিকণ্ঠে উৎকর্ণ হয়েছিলাম, আমাদের এই দুঃখ রয়ে গেল যে, তিনি নতুন স্বর-বিস্তারে আর অগ্রসর হলেন না, বরণ করলেন নীরবতা।